জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক : আমাদের কাজের স্বীকৃতি

অভিজিৎ রায়

১

জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকঃ

মুক্তমনা এ বছর শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক পেয়েছে। আমরা যারা মুক্তমনার সাথে শুরু থেকেই জড়িত, তাদের জন্য এটি সত্যই খুব আনন্দের একটি খবর, এবং গর্বেরও। বছর ছয়েক আগে - সেই ২০০১ সালের ২৫শে মে হয়ত কিছুটা তারুন্যের আবেগ উৎসাহ, কিংবা হয়ত কিছুটা ঝোঁকের মাথায়ই মুক্তমনা নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম - সমমনা কয়েকজন সাথীকে নিয়ে। খুব যে বড় কোন উদ্দেশ্য ছিল তা নয়। যে প্রথাবিরুদ্ধ কথাগুলো দেশে আমাদের উচ্চারণ করতে দেওয়া হয় না, প্রকাশিত হয় না কোন মিডিয়ায়, সেগুলো যেন নির্বিবাদে ঝুট ঝামেলা ছারাই আলোচনা করতে পারি। সোজা কথায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা যেন করতে পারি। এইটেই। মনের গহীনে হয়ত ছিল কুসংস্কার, ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক স্পর্ধিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলবার প্রত্যয়। ছোট্ট একটা সংগঠন - মাত্র জনা ত্রিশেক সদস্য নিয়ে একটা ইয়াহু গ্রুপ। আর আজ? এই ছ'বছরে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে। প্রথম দিকে মূলতঃ বাংলাদেশী সদস্যদের নিয়ে গঠিত হলেও এটি দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায় খুব তাড়াতাড়িই। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ফ্রিথিংকারদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয় মুক্তমনা। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ইরান, সৌদি আরব, দুবাই, জার্মানী, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, ইরান সহ নানা দেশ থেকে সদস্যরা ভীর করতে শুরু করেন, মুক্তমনা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠে এক 'আন্তর্জাতিক' প্রগতিশীল সংগঠন। শুধু জনে বলে যে বেড়েছি তা নয়, আমরা বিগত কয়েক বছরে অর্জন করেছি ঈর্ষনীয় কিছু সাফল্য। কয়েকটি উদাহরণ তো হাতের সামনেই আছে- পত্র-পত্রিকায় আমাদের লেখা এখন নিয়মিতই প্রকাশিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিবছরের বইমেলায় মুক্তমনা লেখকদের একাধিক বই, প্রকাশিত বইয়ের উপর আবার সেমিনার হচ্ছে, সেই সাথে প্রথম আলো, জনকন্ঠ কিংবা সংবাদের মত দৈনিকে সে বইগুলোর রিভিউ করছেন বড় বড় রথী মহারথীরা। ডেইলি স্টার কিংবা জার্মান রেডিও থেকে আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে, রিচার্ড ডকিন্স কিংবা পল কার্জের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকেরা তাদের লেখা আমাদের দিয়ে অনুবাদ করাতে চাইছেন, আমাদের করা অনুবাদ সাগ্রহে তাঁদের সাইটে তাঁরা তুলে রাখছেন; আবার ওদিকে ভারতে প্রবীর ঘোষ তার নিজের লেখা বই আমাদের উৎসর্গ করছেন, কখনো বা দিচ্ছেন তাঁর যুক্তিবাদী সমিতিতে আমাদের আজীবন সদস্যপদ।

ফোরামের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে ষান্মাষিক বা ত্রৈমাসিক লিটল ম্যাগাজিন বের করছেন, সেগুলো সাথে সাথেই পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছে....। কাজেই সব মিলিয়ে মুক্তমনা আজ শুধু একটি ফোরাম নয় কিংবা নয় কোন গৎবাধা ওয়েবসাইট। **মুক্তমনা আজ একটি আন্দোলনের নাম; আকাশ ছোঁয়া এক স্বপ্নের নাম, যে স্বপ্নের বাস্তবতা দিয়েছে একদল উদ্যমী তরুণ।** ফরিদ আহমেদ তার 'মাইলস টু গো' প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক অনেক কিছুই বলেছে, আমি তার সাথে একমত নই। আমি স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, প্রতিষ্ঠানটির মূল চালিকা শক্তি আমি নই, এর চালিকা শক্তি হল নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিপাগল একদল তরুণ তরুণী, যারা বিশ্বাস করে মানবতাবাদে, বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনে, মুক্তবুদ্ধি চর্চায়, বিজ্ঞানমনস্কতায় আর যুক্তিবাদে। তাদের সাথে নিয়েই আমি গড়তে চেয়েছি নতুন পৃথিবী, স্বপ্ন দেখেছি মৌসুমী ভৌমিকের গানের মত করে:

আমি শুনেছি তোমরা নাকি এখনও স্বপ্ন দ্যাখো,
এখনও গল্প লেখো, গান গাও প্রাণ ভরে,
মানুষের বাঁচা মরা এখনও ভাবিয়ে তোলে,
তোমাদের ভালবাসা এখনো গোলাপে ফোটে ।
আস্থা-হারানো এই মন নিয়ে আমি আজ
তোমাদের কাছে এসে দুহাত পেতেছি,
আমি দু'চোখের গহ্বরে শূণ্যতা দেখি শুধু
রাতঘুমে আমি কোনো স্বপ্ন দেখিনা,
তাই স্বপ্ন দেখবো বলে
আমি দু'চোখ পেতেছি ।

তাই তোমাদের কাছে এসে
আমি দু'হাত পেতেছি ।
তাই স্বপ্ন দেখবো বলে
আমি দু'চোখ পেতেছি ।

২

চেতনা মুক্তির লড়াই:

ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি প্রতি বছরই জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক প্রদান করে থাকে। পদক থাকে দুটি। একটি দেওয়া হয় ব্যক্তিকে, আরেকটি দেওয়া হয় সংগঠনকে। এ বছর জাহানারা ইমামের তেরতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মারক সভায় ব্যক্তির জন্য

বিবেচিত পদকটি পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার। আর সংগঠনের পদকটি পেয়ছে মুক্তমনা। পদকটি মুক্তমনার পক্ষ থেকে গ্রহন করেছেন অধ্যাপক অজয় রায়। পদকের স্মারক পত্রে বলা হয়েছেঃ

> *বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুক্তচিন্তার আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে 'মুক্তমনা' ওয়েবসাইট। ২০০০* সালে প্রতিষ্টার পর থেকে দেশে ও বিদেশে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে তরুন প্রজন্মকে সেক্যুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করনের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ক্ষেত্রে 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের তরুন মানবাধিকার কর্মীরা এই ওয়েব সাইটকে তাদের লেখা ও তথ্যের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সম্মৃদ্ধ থেকে সম্মৃদ্ধতর করছেন। ২০০১ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল 'মুক্তমনা' তখন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের পাশাপাশি আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং ধর্ম-বর্ন-বিত্ত নির্বিশেষ মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্টার সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটকে 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক ২০০৭' প্রদান করা হল।*

স্মারকপত্রের প্রথম লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ। ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি এবারের পদক প্রাপ্তির বিবেচনায় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার পাশাপাশি 'মুক্তচিন্তার আন্দোলন'কেও গুরুত্ব দিয়েছে।

তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্নটি এসে পড়ে - এই মুক্তচিন্তার আন্দোলনটি কি, কেন এটি অনন্য কিংবা নিজগুনে স্বকীয়? এ নিয়ে আমি গতবছর মুক্তমনার পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি লেখায় লিখেছিলাম। প্রাসংগিকভাবে আরেকটিবার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরলে বোধ হয় মন্দ হয় না। যে সমাজ আর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা, তার সবটুকুই যে নির্ভেজাল তা বলা যায় না। এতে যেমন প্রগতিশীল বস্তুবাদী উপাদান রয়েছে, তেমনি রয়েছে আধ্যাত্মবাদ, বুজরুকি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসের রমরমা রাজত্ব; রয়েছে অমানিষার ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকার সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় আমাদের চিন্তা

চেতনাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই ‘চেতনার দাসত্ব’ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়- বরং বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন একবার তার একটি লেখায় বলেছিলেন :

> ‘মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার চেয়ে ঢের বেশী সাহসের কাজ।’

কথাটি মিথ্যে নয়। তাই ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, খুব কম মানুষই পারে আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করে স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে, খুব কম মানুষই পারে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। খুব কম মানুষের মধ্যে থেকেই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে একজন আরজ আলী মাতুব্বর, প্রবীর ঘোষ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন কিংবা আহমেদ শরীফ। আমাদের শাসক আর শোষক শ্রেনী আর তাদের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা কখনই চায় না জনগণ প্রথা ভাঙুক, কুসংস্কারের পর্দা সরিয়ে বুঝতে শিখুক, জানতে শিখুক অজ্ঞতা, শোষন আর অসাম্যের মূল উৎসগুলো কোথায়। জনগণের ‘জ্ঞান চক্ষু’ খুলে গেলেই তো বিপদ, তাই না! আর সেজন্যই জনগণকে অন্ধকারে রাখতে চলে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে ধর্মকে পরিবেশন, লাগাতার আধ্যাত্মবাদী প্রচারণা, পত্র-পত্রিকায় ঢাউস আকারে রাশিফল, সর্পরাজ আর আধ্যাত্মবাদী গুরু আর কামেল পীরের বিজ্ঞাপন, মন্ত্রী আর নেতা-নেত্রীদের মাজার আর দরগায় সিন্নি দেওয়া অথবা নিবাচন উপলক্ষে হজে যাওয়া, মাথায় কালো পট্টি বাধা। মুক্তমনাদের লড়াই এই সামগ্রিক অসততার বিরুদ্ধে, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসকে উস্কে দেওয়া এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে। এ লড়াই বৌদ্ধিক, এ লড়াই সাংস্কৃতিক। এলড়াই সমাজকে প্রগতিমুখী করবার ব্রত নিয়ে সামগ্রিক অবক্ষয় আর অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করবার লড়াই। এ লড়াই আক্ষরিক অর্থেই আমাদের কাছে চেতনামুক্তির লড়াই।

চিন্তার এ দাসত্ব থেকে মুক্ত করার লড়াই এর ময়দানটি একদিনে গড়ে উঠে নি। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা আমরা মনে করি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়েরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক আভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙালির এক নবজাগরণ যেন। এ নবজাগরণকে রূপ দিতেই আবির্ভাব হয়েছিল মুক্তমনার, প্রথমে ফোরাম হিসেবে, পরে রূপ নিয়েছিল সামগ্রিক একটি ওয়েব সাইটে। এর পরের কাহিনী তো ইতিহাস। মুক্তমনার অবদান যে কোথায় পৌঁছিয়ে গেছে তার উল্লেখ মেলে জাহানারা ইমাম পদকের স্মারক লিপিতে - ‘দেশে ও বিদেশে তরুন প্রজন্মকে সেক্যুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ক্ষেত্রে মুক্তমনা ওয়েব সাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে।’

৩

চার্বাকদের কথা:

কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর শাস্ত্রানুগত্য মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার যে দরকার যে আছে তা তো আর নতুন করে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। প্রাচীন ভারতের সেই যুক্তিবাদী চার্বাকরা অনেক আগেই তা বুঝেছিলেন। তারা তাদের মত করে যুদ্ধ করে গেছেন। আত্মাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ চার্বাকদের লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আত্মাই যদি না থাকবে তবে কেন অযথা স্বর্গ নরকের কেচ্ছা-কাহিনীর আমদানী। কাজেই আত্মা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঠোঁট কাটা চার্বাকেরা ঈশ্বর-আত্মা-পরলোক-জাতিভেদ-জন্মান্তর সব কিছুকেই তারা নাকচ করে দেন। তারাই প্রথম বলেছিলেন বেদ 'অপৌরুষেয়' নয়, এটা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষেরই রচিত। জনমানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া সেই সব স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণদের চার্বাকেরা ভন্ড, ধূর্ত, চোর, নিশাচর বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা বাতিল করে দিয়েছিলেন আত্মার অস্তিত্ব, উন্মোচন করেছিলেন ধর্মের জুয়াচুরি এই বলে :

> 'বেহেস্ত ও মোক্ষপ্রাপ্তি কি পরিত্রাণলাভ ফাঁকা অর্থহীন অসার বুলিমাত্র, উদরযন্ত্রে বিসর্পের কারণে সবেগে উৎক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় ঢেকুরমাত্র। এসব প্যাক প্যাক বা বাকচাতুরি নৈতিক অপরাধ, উন্মার্গ গমন, মানসিক ও দৈহিক ঔদার্যের ফলশ্রতি -পরান্নভোজী বমনপ্রবণ ব্যক্তিদের অদম্য কুৎসিৎ বমনমাত্র, পেটুকদের এবং উন্মার্গগামীদের বিলাস-কল্পণা। পরজগতে যাওয়ার জন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমের নির্দিষ্ট মেকি নিয়ম-আচার আসলে কোন ফল উৎপন্ন করে না। বর্ণাশ্রমের শেষ পরিনামের কাহিনী সাধারণ মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে গাঁজাবার খামি বিশেষ।'

চার্বাকেরা বলতেন, চতুর পুরোহিতদের দাবী অনুযায়ী যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলিকৃত প্রাণী সরাসরি স্বর্গলাভ করে, তাহলে তারা নিজেদের পিতাকে এভাবে বলি দেয় না কেন? কেন তারা এভাবে তাদের পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে না? :

যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে
তবে পিতাকে পাঠতে স্বর্গে
ধরে বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।

চার্বাকেরা আরো বলতেন :

'চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা
তবে ত পিন্ডদান নেহাতই বৃথা।'

কিংবা

যদি শ্রাদ্ধকর্ম হয় মৃতের তৃপ্তের কারণ
তবে নেভা প্রদীপে দিলে তেল, উচিৎ জ্বলন।

এ হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথা - তখনো শ্রেণী শোষণ বুঝাবার জন্য মার্ক্স এঙ্গেলসের জন্ম হয় নি। চার্বাকেরা তাদের মত করেই শ্রেনী শোষণের মর্মবাণীটুকু বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন ধূর্ত স্বার্থান্বেষী ব্রাক্ষণেরা শোষণের সুবিধার্থে বেদের শ্লোকগুলো ঈশ্বরের বাণী হিসেবে প্রচার করেন। এখানে শ্রেনীচেতনার বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট। ব্রাক্ষণ পান্ডারা যে লোক ঠকানোর ব্যবসা ফেঁদেছে, আর ধর্ম জিনিসটাই যে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা চার্বাকেরা তাদের লেখায় প্রথম থেকেই স্পষ্ট করেই বলেছেন। ফলে দেখা যায় এই চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কেবল বৈপ্লবিক ভূমিকাই পালন করেনি, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আরো অনেক প্রগতিশীল ও বস্তুবাদী মতপ্রকাশের ক্ষেত্র তৈরীতে একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছিল।

সাংখ্য, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনঃ

চার্বাক দর্শনের পরবর্তী সাংখ্য দর্শনের কথাও বলা যায় প্রসঙ্গতঃ। সাংখ্য যীশুখ্রীষ্টের ছ'সাতশ বছর আগে জন্মেছিলেন। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা ছিল না; এই দর্শনের আচার্যরা ঈশ্বরীয় শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার কিংবা ঈশ্বরকে 'আদি কারণ' ভেবে নেবার পক্ষে কোন যৌক্তিক সমর্থন খুঁজে পাননি।

চার্বাক ও সাংখ্য দর্শনের প্রভাবে পরবর্তীতে বৌদ্ধ ও জৈন - এ দুই বিখ্যাত ধর্মমত জন্মলাভ করেছিল। বৈদিক যুগের আচার সর্বস্বতা, তুক তাক, যাগযজ্ঞ, কুসংস্কার, জাতিভেদ সহ নানা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী মতবাদ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এ দুই মতবাদ। এ দুই দর্শনের স্রষ্টা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর মূলতঃ আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। ঈশ্বর আছেন কি নেই, সেটাকে তারা গৌণ মনে করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন ও জৈন দর্শন উভয়েই প্রথম দিকে নাস্তিক্যবাদী দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে এর অনুসারীগন একে একেবারে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' বানিয়ে ফেলেন। প্রবর্তকদের দার্শনিক মর্মবাণী ভুলে গিয়ে এদের অনুসারীরা পুজা-অর্চনা, নানা ধরনের তুক-তাক আর আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ বুদ্ধদেব আর মহাবীর দুজনই আর্য ধর্মের অমানবিকতা, নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা, আর বৈদিক অপ্রয়োজনীয় আচার আচরণের বিরুদ্ধেই

মূলতঃ বিদ্রোহ করেছিলেন। চার্বাক, সাংখ্য, বৌদ্ধ কিংবা জৈন ধর্মের অনুসারী ছাড়াও প্রাচীন ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন । যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিনহাজার বছর আগে থেকেই ভারতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, সংশয়বাদ আর যুক্তিবাদ বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে। বৃহস্পতি, ধীষণ, পরমেস্তিন, ভৃগু, কপিলা, কশ্যপমুনি, ঋষি জাবালি, মসকরী গোষল, পুরন্দর, চানক্য, রাজাবেন, বাৎসায়ন, ভাগুরী প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেই ভারতে যুক্তি আর মুক্তবুদ্ধির আলো ছড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। উদ্দালোক অরুনী, অজিতকেশকাম্বলী প্রমুখেরা বুদ্ধের সমসাময়িক মুক্তমনা। প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে এ ধরণের বাষট্টি জন বিদ্রোহী মুক্তমনাদের কথা জানা যায় যাঁরা সে সময় যুক্তির নিরিখে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মশাস্ত্র ও ভাববাদী দর্শনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

৪

মোতাজিলাদের কথা:

মোতাজিলারা ছিল প্রথম সম্প্রদায় যারা ইসলামের মধ্যে থেকে যুক্তিবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন। তাদের কর্মকান্ড শুরু হয়েছিল বসরাতে। তারা সংশয়বাদী দৃষ্টি নিয়ে আল্লাহ, কোরান আর পয়গম্বরদের দেখতেন (এমনকি মোতাজিলাদের অনেক আগে হযরত মুহম্মদের জীবিতকালেই অনেকে আল্লাহ, কোরান আর মুহম্মদের নবুওত নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি কেউ কেউ বিদ্রুপ করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছিলেন। কোরানের কোন কোন আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে, সে সমস্ত কবিদের ‘শয়তান’ আখ্যা দিয়ে (দেখুনঃ কোরান ২৬:২২৪)) । পরবর্তীতে গ্রীক ও রোমান দর্শনে প্রভাবিত হয়ে মোতাজিলারা নিজেদের মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিয়োজিত করেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে তাঁরা কোরানের অলৌকিকতাকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করতেন কোরান কোন আনাদি ও অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ নয়। আল্লাহর তার বান্দাদের বিপথে চালনা করা কিংবা অযথা নরকের ভয় দেখানোকেও মোতাজিলারা অযৌক্তিক ও বালখিল্য বলে মনে করতেন। খলিফা হারুন-অর-রশীদ আর আল মামুনের শাসনকাল (৭৮৬-৮৩৩ খ্রীঃ) ছিল মোতাজিলা সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষরিক অর্থেই এক সুবর্ণ যুগ। এ দুই খলিফা মোতাজিলা সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন আর জ্ঞান চর্চাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। মোতাজিলাদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতিতে প্রেরণা যুগিয়েছিলো। কিন্তু নবম শতাব্দীর শেষে এসে ইসলামের ভিতর মৌলবাদী ধারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর মোতাজিলা সম্প্রদায় আর সে সময়সকার অন্যান্য মুক্তমনারা নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হন নিদারুনভাবে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে যান

মোতাজিলা বিরোধী আল্ আশারী, আল্ গাজ্জালীর মত গোঁড়াপন্থি লোকজন। তারা মোতাজিলাদের এতোদিনের গড়ে তোলা অনুসন্ধিৎসু মননকে সমূলে বিনাশ করতে সচেষ্ট হন আর 'ধর্মীয় জোশে' প্রচার করেন -

> 'তনুকিদ্ (যুক্তিবাদ ও জ্ঞান বিজ্ঞান) নয়, তকলিদ্ই (অন্ধবিশ্বাসের অনুসরণ ও অনুকরণ) মুক্তির একমাত্র পন্থা। তকুনিদ্ হারাম, অধর্ম, কুফর আর কবিরা গুনাহ্।'

ইসলামের প্রথম দিকে যে তুলনামূলক সহনশীল পরিবেশে জ্ঞান চর্চার যে সুযোগ তৈরী হয়েছিল তা নবম শতাব্দীর শেষভাগে এসে গাজ্জালীদের হাতে পড়ে কূপমন্ডুকতায় রূপান্তরিত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকে প্রতিহত করে মুক্তমনাদের উপর আক্রমণ সে সময় ইসলামের অনুসারীদের এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আগেই আবু যার গিফারীকে খাদ্য আর পানীয় থেকে বঞ্চিত করে মরুভূমিতে বেঁধে রেখে হত্যা করা হয়। ইবনে সিনা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, দেশ ত্যাগ করে কোন রকমে বাঁচলেন। ইবনে রুশদেরও প্রায় একই দশা হয়। প্রগতিশীল যুক্তিবাদী ইবনে যিরহামকে ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে আর আল-দিমিস্কিকে ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র যুক্তিবাদী মোতাজিলারাই নন, ইসলামে মরমীয়া চিন্তাধারা সহ সমস্ত সহনশীল মতাদর্শকে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিলো। কূপমন্ডুকতার চর্চা আর 'ফ্রিথিঙ্কার' শুনলেই ফতোয়া দিয়ে হত্যা করার যে রীতি নবম শতাব্দীতে চালু হয় মূলতঃ গাজ্জালী গংদের হাত দিয়ে, তার অভিশাপ থেকে ইসলাম আজো মুক্ত হতে পারে নি। কট্টর মোল্লাদের কাছে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর বিরুদ্ধ মতবাদ কী দারুণভাবে অসহনীয় তা দেখতে পাই আজকের সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিন কিংবা হুমায়ুন আজাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মনোভাবে।

৫

বাংলার 'রেঁনেসা': বিদ্যাসাগর, রামমোহন ও ডিরোজিও

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আর উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলার চিন্তা-চেতনার জগতে এক জাগরণের সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় রেঁনেসার সাথে তুলনা করে কেউ কেউ একে 'বাংলার রেঁনেসা' বলেও অভিহিত করেন। এ জাগরনের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের পশ্চাৎপদ যুক্তিবিরোধী আচার প্রথা, কুসংস্কার ও নিশ্চল স্থবির সমাজ কাঠামোতে কাঁপন ধরিয়েছিলো। এ রেঁনেসার দু'জন পুরোধা পুরুষ হলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এদের প্রভাব প্রসঙ্গে সুহাস চট্টোপাধ্যায় তার মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব বইয়ে বলেন,

‘রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে আরো বেশি বস্তুবাদী চেতনার বিকাশ ঘটালো এবং তা মাইকেল দীনবন্ধুর সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রীতিমত বৈপ্লবিক লড়াইয়ে পরিণত হল’।

রামমোহন রায়কেই (১৭৭২-১৮৩৩) ‘বাংলার রেঁনেসা’র পথিকৃত বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইউরোপীয় উদারনৈতিক ভাবাদর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ হন। তার আন্দোলন ছিল মূলতঃ ধর্মসংস্কার ভিত্তিক। সনাতন ধর্মের বহু যুক্তিবিরোধী আচার আচরণকে শাস্ত্র থেকেই যুক্তি উথাপনের মাধ্যমে খন্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের নানা দেব দেবীর পূজা-অর্চনাকে অযৌক্তিক প্রমাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন এই বলে - ‘মূর্তিপূজো সমাজের বিন্যাসটা ধবংস করে দেয়।’ তিনি নিরাকার ঈশ্বরভিত্তিক একেশ্বরবাদের পক্ষে তার যুক্তিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। তার এই ভাবনার পেছনে ইসলামের প্রভাব ছিল যথেষ্টই। একেশ্বরবাদী ধারণাটা আসলে রামমোহনের সময় নতুন কিছু ছিলো না। রামমোহনের জন্মের অনেক আগেই ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদী তত্ত্ব নিয়ে আসেন মুসলমানেরা - সেই যে সপ্তম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়। তার পর থেকে অষ্টম শতাব্দী থেকে উপমহাদেশে খুঁটি গাড়া মুসলিম মরমী সাধকেরা একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। রামমোহন নিজেও পাটনায় থাকাকালে ইসলামের উদারনৈতিক মোতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত হন। এ প্রেক্ষিতেই রামমোহন ও তার অনুসারীরা ১৮২৮ সালের ২০শে আগাস্ট গঠন করলেন ‘ব্রাহ্মসভা’। এই ব্রাহ্মসভার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ রূপ। তারপরও বলা যায়, ব্রাহ্মসভার উদ্দেশ্য মোটেও সফল হয়নি। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্মসমাজ তার কিছু গুণমুগ্ধ কিছু অনুগামী (যারা ছিলেন মূলতঃ নব্য ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং রাজা-মহারাজা ও জমিদার) ছাড়া সাধারণদের মধ্যে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৮৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের গতি ঝিমিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করে কিছুটা প্রাণের জোয়ার আনতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথার এই ‘ব্রাহ্মধর্ম’ হিন্দু ধর্মের বিশাল পরিসরে বিলীন হয়ে যায়।

তবে রামমোহনের সবচাইতে বড় অবদান হল সতীদাহের মত একটা অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। তিনি শাস্ত্র ঘেটে সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং সাথে সাথে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক ও বিচারশক্তিকে এই প্রথার বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে ইংরেজরা সতীদাহের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহসী না হলেও, রাজা রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করার জন্য প্রবল জনমত গড়ে তুললে ১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ করে আইন জারি করলেন। শুধু সতীদাহ বন্ধই নয়, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেও রামমোহনের ভূমিকা ছিল। তিনি নিজ উদ্যোগে এংলো হিন্দু বিদ্যালয়, বেদান্ত মহাবিদ্যালয়সহ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সেখানকার পাঠ্যসূচীতে বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা আর পাশ্চাত্য দর্শন অন্তর্ভুক্ত করেন।

সমাজ সংস্কারে রামমোহনের ব্যাপক অবদান থাকা সত্ত্বেও জমিদারী প্রথার সাথে রামমোহনের সরাসরি সম্পর্ক থাকার ফলে তিনি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার খপ্পর থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের** (১৮২০-১৮৯১) ছিল না। জমিদারী প্রথার সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় তিনি বহুক্ষেত্রেই বলিষ্ঠভাবে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন। ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা ছিল না বলেই মনে হয়। তিনি পুরাতন ও প্রথাগত শাস্ত্রানুগত্যকে সরাসরি মিথ্যা বলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু আচার আর সাংস্কৃতিক আচার আচরণের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহনের তুলনায় অনেক বেশী নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষা প্রসারের জন্য নিজেও অনেকগুলো বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন তিনি। মেয়েদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যেমনি সরব ছিলেন তিনি, পুরুষদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও ছিলেন প্রতিবাদমুখর। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল হিন্দুদের বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। আর এ ধরনের সনাতন প্রথা ভাঙতে তিনিও রামমোহনের মতোই ধর্মগ্রন্থ ঘেটে অনেক যুক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন, এবং গোড়া ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই তার ক্ষুরধার যুক্তির আক্রমনে পিছু হটেছিলেন।

রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের চেয়ে চিন্তা চেতনায় ঢের বেশী 'র‍্যাডিক্যাল' ছিলেন **হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও** (১৮০৯-১৮৩১)। কিশোর বয়সেই ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভাতৃত্বের বাণী আর মুক্তবুদ্ধি চর্চার বাঁধভাঙা জোয়ার তাকে আলোড়িত করেছিলো। শিক্ষক ড্রামন্ডের 'সেক্যুলার' চিন্তাধারা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। 'ভিনদেশী' হলেও ডিরোজিও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলেই মনে করতেন। ১৮২৬ সালে তিনি হিন্দু কলেজে (বর্তমানে প্রসিডেন্সি কলেজ) শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ডিরোজিও। প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে তিনি ছাত্রদের যুক্তিনিষ্ঠা ও বস্তুবাদী চিন্তাধারায় আগ্রহী করে তুললেন। তাঁর যুক্তিবাদী মন মানসিকতা ও মুক্তমন ছাত্রদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান যথেষ্ট মনে না হওয়াতে তিনি ছাত্রদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হতেন। এই বৈঠকের একটা গালভরা নামও ছিল - 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। সত্যবাদিতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় আলোচনা হত, অনেকটা আমাদের 'মুক্তমনা' ফোরামের মতই। তিনি ছাত্রদের এ ধরণের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের স্বাধীনভাবে তর্ক-বিতর্ক করার উপযোগী করে করে গড়ে তুলতেন।

খুব তাড়াতাড়িই ডিরোজিওর প্রভাব ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কলেজের সেরা ছাত্ররা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মূলতঃ ডিরোজিওর নেতৃত্বেই সে সময় কলকাতায় ইয়ং বেঙ্গল

হিসেবে পরিচিত সেই সব 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'এরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। এরা অস্বীকার করল উপনয়ন, সান্ধ্য আহ্নিক ছাড়ল, প্রাচীন প্রথাকে অমান্য করল, নারী শিক্ষার দাবী তুলল। তারা প্রতিদিনের আহ্নিকে মন্ত্রোচ্চারণের বদলে ইলিয়ড থেকে আবৃত্তি করতে লাগল; তুলে আনতে লাগলো ভয়ঙ্কর সব স্পর্শাতীত বিষয় - সতীদাহ, কুলীন ও বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ সব কিছুর বিরুদ্ধেই তারা সোচ্চার হয়েছিল। নিজেদের সংস্কারমুক্ত প্রমাণ করতে এমনকি গোমাংস খাওয়া এবং মদ্যপান করাও তারা শুরু করল, প্রকাশ্যে। ভারতীয় অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তনে সে সময় এক নবমন্ত্রের ঝড় তুলেছিলেন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামের ডিরোজিওর এই ভাবশিষ্যরা। রামমোহন যা পারেননি, ডিরোজিও তাই করে দেখাতে চাইলেন। রামমোহন পুরনো প্রথাকে ভাঙার লড়াই শুরু করেছিলেন ঠিকই কিন্তু মূল উৎসে গিয়ে সেই গোঁড়াই রয়ে গিয়েছিলেন। পারেননি তিনি পুরোপুরি কুসংস্কার মুক্ত হতে, পারেননি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ী হতে। ধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই আরেকটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। প্রবীর ঘোষ তার 'অলৌকিক নয় লৌকিক' (তৃতীয় খন্ড) গ্রন্থে তাই বলেন :

> 'ধর্মান্ধতার ঊর্ণজাল কে ছিন্ন করেছিলেন? রামমোহন রায়? রামমোহন রায় তো সয়ং ধর্মমতের স্রষ্টা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দির ও দেবমন্দির ভাঙে কালের করাল গ্রাসে। অথবা নিশ্চিহ্ন হয় কেউ নিশ্চিহ্ন করে দিলে। নিরাকার ঈশ্বরকে ওভাবে মুছে ফেলা যায় না। এমনই এক ঈশ্বর চিন্তা জনমানসে প্রথিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন, যেখানে ঈশ্বর থাকবেন অনেক নিরাপদে।'

'ইয়ং বেঙ্গল'রা বরং এ দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর ছিলো, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসলো, ফলে আনুসঙ্গিক ছোট খাটো কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তারা ধর্মকে আশ্রয় না করেই মুক্তচিন্তাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের লক, বেকন প্রমুখ দার্শনিকদের যুক্তিবাদী চিন্তা দিয়ে।

সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা খন্ডনে রামমোহন যেখানে বেদ পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে ডিরোজিও নিখাঁদ নির্ভেজাল যুক্তিবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রনির্ভর সমাজকে পাল্টাতে গিয়ে যে জ্ঞান এবং যুক্তির আলো জ্বালিয়েছিলেন, তাতে প্রমাদ গুনলেন সমাজের কর্তাব্যক্তিরা। তারা উঠে পড়ে লাগলেন এই 'নাস্তিক'কে সমাজের কচি কচি ছেলেগুলোর 'মাথা খাওয়া' থেকে বিরত করতে। ডিরোজিওর অপরাধ তিনি ছেলেদের 'অবান্তর প্রশ্ন' করতে শেখাচ্ছেন। এ ধরণের অভিযোগ সক্রেটিসের বিরুদ্ধেও উঠেছিলো। সেই যে এথেন্সের যুবকদের প্রথাবিরোধী চিন্তায় প্রভাবিত করে মাথা খাওয়ার অভিযোগ। পরিনতিতে সক্রেটিস তুলে নিয়েছিলেন হেমলকের পাত্র। ডিরোজিওর পরিনতিও অনেকটা সেরকমই। ১৮৩১ সালে হিন্দু কলেজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভার পরে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। তিনি পদত্যাগ

করলেন। কলেজ কমিটির সদস্য ডাঃ এইচ উইলসনকে তিনি চিঠিতে লিখলেন :

> ' ...তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে মুক্তমন নিয়ে আলোচনা যদি অপরাধ হয় তবে নিজেকে অপরাধী হিসেবে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই; কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে আমি ভীত অথবা লজ্জিত নই যে দার্শনিকদের এই বিষয়ক সন্দেহের সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, এবং তা সমাধানের কথাও বলেছি।...
>
> এই শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামির মূল যদি নড়ে থাকে তবে আমি কি অপরাধী? ... ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা করলে নাস্তিক ও নরাধম আখ্যা পেতে হয়, একথা আমি জানি।'

ডিরোজিও যে কেবল দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবী ছিলেন তা নয়, তার রাজনৈতিক দর্শনও ছিল প্রগতিশীল। ১৮২৭ সালে ডিরোজিও দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির জয়গান গেয়ে 'ক্রীতদাসের মুক্তি' রচনা করেন। জমিদারদের সঙ্গে কিংবা জমিদার সভার সঙ্গে ডিরোজিও পারতপক্ষে কোন সম্পর্ক রাখতেন না, বরং জমিদারদের নানা রকম শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতেন। নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে তিনি বলেন :

> 'Whatever tendency the permanent settlement of Lord Cornwallis might have to spirited and large improvement of the country, it is certain, that but a small part of his golden prospects has yet been realized. Wealth and happiness were the sum of those prospects, but little of these is visible anywhere.'

ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করে 'জংলি ভারতবাসী'কে একেবারে উদ্ধার করে দিয়েছেন বলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আর তাদের মোসায়েবের দল যেখানে নগ্নভাবে উপনিবেশবাদের সাফাই গেয়েছেন, সেখানে ডিরোজিও শুনিয়েছেন অন্যকথা, অন্যগান । তিনি 'ক্যালকাটা মানথলি জার্নালে' লেখেন :

> 'ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করার আগে এদেশ বর্বরতার স্তরে ছিল, এ কথা মনে করবার অধিকার ইংরেজদের কে দিয়েছে? ভারত ছিল একটি শিল্পসমৃদ্ধ, উন্নত ও সভ্য দেশ এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে, তবেই ভারতবাসীর দুর্গতি মোচন সম্ভব।'

কলেজ থেকে পদত্যাগের বছরেই ডিরোজিওর মাত্র ২২ বছর বয়সে অকাল প্রয়ান ঘটে। তার মৃত্যুতে শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, 'দৈত্যাকার মিথ্যার তান্ডব নৃত্যের দাপটে একজন তরুণ শিক্ষকের জীবন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।' তার পরও প্রায় একযুগ ধরে তার শিষ্যদের মধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিলো।

সত্যই কি রেঁনেসা?

সমাজ বদলের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর কিংবা ইয়ং বেঙ্গলদের যথেস্ট অবদান থাকলেও সে সময়টাকে ইউরোপীয় রেঁনেসার আদলে সত্যই 'বাঙলার রেঁনেসা' বলা যায় কিনা এ প্রশ্ন থেকেই যায়। ইউরোপের রেঁনেসা ছিল সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আর্থ সামাজিক ও সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাল্টানোর আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু শহরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, ছড়িয়ে পড়েছিলো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এ ব্যাপারটা কিন্তু বাঙলার রেঁনেসা-ওয়ালাদের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য নয়। এ ক্ষেত্রে 'সমাজ পরিবর্তনের' সুফল ঘরে তুলেছিলো কেবল বঙ্গীয় জমিদার সম্প্রদায়, শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বাংলার রেঁনেসা আন্দোলনের প্রাণপুরুষদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজদের সহযোগী অথবা ইংরেজ-সহযোগীদের সন্তান। রেঁনেসার নায়কদের এই শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে তাদের আন্দোলন ব্যাপক গণজাগরণে রূপ নিতে পারে নি। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চাকরী বা ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে জমিদারীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়ায় রেঁনেসার পথিকৃতেরা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুন্ঠনকে দেখতে পাননি (এদের মধ্যে ডিরোজিওই ছিলেন ব্যতিক্রম)। বরং ব্রিটিশদের সংস্পর্শে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। রামমোহন তো খোলাখুলি বলেছেন : 'ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য যে ভগবৎকৃপায় তাহারা ইংরেজদের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে'। যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সেই নীলকরদের সাফাই গেয়েছিলেন রামমোহন। তাঁর মতে, 'নীলকর সাহেবেরা এ দেশে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই করেছেন বেশী'। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্যক্ষ সুফল যেহেতু রামমোহন পাচ্ছিলেন, সেহেতু তিনি বলেছিলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে লংঘন করা উচিৎ নয়'। বঙ্কিমচন্দ্রও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাফাই গেয়ে বলেছেন, এটি বন্ধ করলে 'ঘোর বিশৃংখলা উপস্থিত হইবে।' তিনি জমিদার দর্পন নাটকের প্রচার বন্ধ করতে বলেছিলেন, 'নীল দর্পন' নাটকের তো সরাসরি বিরোধিতাই করেছেন। রামমোহন ব্যক্তিগত জীবন কাটিয়েছেন আর দশটি জমিদারদের মতই ভোগ-বিলাসে। এমনকি সোফিয়া ডবসন কলেটের 'Life and letters of Raja Rammohun Roy' থেকে জানা যায় রামমোহন ব্যক্তিজীবনে জাতপাত মানতেন, অহিন্দু বা অন্য জাতের সাথে কখনও একসাথে আহার করতেন না। হিন্দুদের প্রচলিত সামাজিক আচরণগুলো পরিবর্তনের বিপক্ষে ছিলেন রামমোহন। তার কাঁধের উপবীত তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত বহাল রেখেছিলেন। আর সাম্রাজ্যবাদ তোষণ তো ছিলই। আবদুল মতিন খান 'ব্রাহ্মধর্ম : প্রকরণ ও প্রেক্ষাপট' প্রবন্ধে সর্বসাধারণের উদেশ্যে রামমোহনের যে 'ফতোয়া'গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিম্নরূপ :

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাকত্ব মেনে নাও। তার মত হবার চেষ্টা কর।
(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঈশ্বরের অফুরন্ত করুণার ধারা।
(৩) ইংরেজী ও ইংরেজীয়ানা ভাল করে রপ্ত কর। ইংরেজদের অধীনে একটি চাকুরীলাভের আপ্রাণ চেষ্টা কর।
(৪) স্বাধীন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হবার কখনো চেষ্টা কোর না। ইংরেজদের দালালী করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।
(৫) ইংরেজকে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসে উৎসাহ যোগাও। তাহলে ব্রিটিশদের উন্নত ও উদার সাহচর্যে থেকে দেশকে স্বর্গ বানাতে পারবে।
(৬) সভাসমিতি গড়ে তোল এবং সেগুলোর মাধ্যমে যখন তখন ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখাও। মনে রেখো ইংরেজদের খুশীতে তমার মঙ্গল।
(৭) সংবাদপত্র প্রকাশ কর, তাতে ব্রিটিশ শাসনের সুফল তুলে ধর।
(৮) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে ও বিদ্বেষভাব পোষণ করে তাদের কঠোরভাষায় নিন্দা কর। তাদের নির্মুলে ইংরেজদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কর।
(৯) ইংল্যান্ডে কাঁচামাল রপ্তানী ও সেখান থেকে তৈরী সামগ্রী আমদানীর অবাদ বানিজ্য সমর্থন কর। কারণ তাতে ভারতের সার্বিক কল্যান নিহিত।
(১০) রাজনৈতিক সুবিধাদি লাভ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ধর্মাচরণে পরিবর্তন সাধণ কর। এটা করলে ইংরেজদের অনুমোদন পাবে।

বিদ্যাসাগর ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নির্মোহ হলেও সামাজিক বৈষম্য ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেননি। তিনি নিজের মেট্রোপলিটান ইনসটিটিউশনে কোন মুসলমান ছাত্রকে ভর্তি করতে পারেননি। জাতিভেদের বিরুদ্ধেও তিনি কোন আন্দোলন পরিচালনা করেননি। তিনি শিক্ষাকে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন। তিনি 'Downward filtration theory' নামের আজুগুবে তত্ত্বের উপর আস্থা রেখে ভাবতেন, সমাজের উপরের স্তরে বিদ্যা ঢেলে দিলে তা এমনিতেই চুইয়ে নীচের স্তরে নেমে আসবে।

বাংলার তথাকথিত রেনেঁসার কর্ণধরদের সমস্যা ছিল এই যে, তারা প্রগতিকে ব্রিটিশ প্রগতির সমার্থক হিসেবে গন্য করেছেন এবং ব্রিটিশরা যে আমাদের দেশে আধা-ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে গেছে, তা বারবারই সজ্ঞানে এড়িয়ে গেছেন। একটি ঔপনিবেশিক দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরোধিতা করাটাই কোন আন্দোলনের পক্ষে বা ব্যক্তির পক্ষে প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত করার মাপকাঠি হওয়া উচিৎ। ঔপনিবেশিক প্রভুর দালালি করাটা কখনই প্রগতিশীল মুক্তমনাদের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

বাঙালী রেঁনেসার আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা হল, রেঁনেসার সাথে সম্পর্কিত বেশীরভাগ সমাজ সংস্কারই তদানিন্তন মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ছিল অর্থহীন। ইসলামে সতীদাহ এমনিতেই কখনও ছিল না। মুসলিম বিধবারা সব সময়ই বিয়ে করতে পারে- ধর্মীয় কোন বাধা কখনই ছিল না। কনের পূর্ণ সম্মতিতে বিয়ে করতে হয় বলে এতে একটা চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপার থাকে। অতএব মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ থাকতে পারে না (বাস্তবে যেটুকু আছে তা বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণ এবং হিন্দু প্রতিবেশীদের কারণে)। মুসলমানরা সব সময়ই গো-মাংস

খেতেন, ফলে ইয়ং বেঙ্গলদের এত ঘটা করে গো-মাংস খাওয়ার মধ্যেও তারা কোন অভিনবত্ব খুঁজে পান নি। অর্থাৎ যে কয়টি বিষয়কে ঘিরে বাংলায় রেঁনেসাস বা সমাজ সংস্কারের ঝোঁক দেখা গেছে, তার প্রায় সবকটি সংস্কারেরই উর্দ্ধে ছিল বাংলার মুসলিম সমাজ। কিন্তু তাতে করে কি বাংলার মুসলিম সমাজের কোন অগ্রগতি ঘটেছে? শোষণমুক্তি ঘটেছে? না ঘটেনি। বাংলার মুসলিমদের সংখ্যাগুরু অংশ বরাবরই ছিলেন হিন্দু সংখ্যাগুরু অংশের চেয়ে পিছিয়ে পড়া, অনেক অনেক বেশী শোষিত।

৬

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা:

১৯২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আত্মপ্রকাশ করে '**ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ**'। আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদির, আবুল ফজল প্রমুখ লেখকেরা ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজকে ঘিরে যে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' গড়ে তুলেছিলেন, তা চিন্তার জগতে আলোড়ন তুলেছিল। নামে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হলেও কেবল 'ইসলামী সাহিত্য' সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য ছিলো না। বরং মুসলিমদের পশ্চাৎপদতা ও কূপমুন্ডুকতাকে আঘাত করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। তাদের লেখার মধ্যে দিয়ে মুক্ত চিন্তার যে স্ফুরণ ঘটেছিল তা সত্যই অভিনব। প্রচলিত ধর্মমতের সাথে তাদের লেখালিখি কথাবার্তার মিল না থাকায় তারা বারবারই গোঁড়াপন্থিদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। 'শিখা'র মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বল্পকালীন আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়েই 'শিখা' নামটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল পূর্ববাংলার শাস্ত্র, প্রথা, আনুগত্য আর অন্ধকার ভেদ করা এক উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চিন্তার নবজাগরণ। 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' - এ ছিলো শিখার স্লোগান। মোতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ আর ডিরোজিও- রাম মোহনের উদারনৈতিক চিন্তা দিয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন মুসলিম সাহিত্যসমাজের লেখকেরা। শিখার লেখকেরা চিন্তা চেতনায় কত অগ্রসর ছিলেন, তা দু'একটি নমুনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমি আবুল হুসেনের 'মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> ‘‘কাজের পেছনে চিন্তা চাই। ... চিন্তাই Phylosophy। Religion (ধর্ম) বলছে : ‘চোখ বুজে মেনে চল’। Phylosophy (দর্শন) বলছে ‘চোখ খুলে চেয়ে দেখ।’ একটার বাহন হল ভক্তি, অন্যটার বাহন হল জ্ঞান।’’

কাজী আবদুল ওদুদের এমনি একটি লেখা থেকে উদাহরণ টানা যাক :

> ‘‘বিজ্ঞানই হচ্ছে চিন্তার পরশমনি; এর অভাবে ব্রক্ষবিদ্যাও যাদু-বিদ্যায় পরিণত হতে পারে। একালে ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে-ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌন।’’

এ ধরনের অসংখ্য উদ্ধৃতি হাজির করে দেখানো যায় যে, সেসময়কার মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকেরা যথেস্ট পরিমানেই প্রথাবিরোধী, শাস্ত্রবিরোধী ও যুক্তিবাদী মননের পরিচয় দিয়েছেন। আজ থেকে সাত-আট দশক আগেকার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে, লেখকদের সাহসিকতার নমুনা দেখে সত্যই অবাক হতে হয়। আজকের দিনেও কি অমন সাহসিকতার সাথে বাংলাদেশে কিছু বলা সম্ভব? একবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সাহিত্য সমাজের একটি বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন :

> ‘বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম যে, মৌঃ আনোয়ারুল কাদীর-প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আমি চাই না।’

স্বাভাবিভাবেই এই সমস্ত স্বঘোষিত কাফেরদের ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলন নির্বিঘ্ন ছিল না। এতো স্বাভাবিকই; ইতিহাস খুঁড়লে দেখা যায়, যখনই সমাজে একদল প্রথাবিরোধী মানুষ সাহসিকতার সাথে সত্য উচ্চারণ করেছে, শাসক শ্রেনীর তল্পিবাহক আর ধর্মান্ধরা তাদের উপর হা-রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের ক্ষেত্রেও তাই হল। কাজী আবদুল ওদুদের ‘সম্মোহিত মুসলমান’ আর আবুল হুসেনের ‘নিষেধের বিরম্বনা’ প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হলে মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিখার লেখকদের শক্তিশালী লেখনী থামানোর জন্য নানা ধরনের ভয় ভীতি আর পেছনে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ১৯২৯ সালের ৮ ই ডিসেম্বর আহসান মঞ্জিলে ‘ইসলামিয়া আঞ্জুমান’ অফিসে এক বিচার সভার আয়োজন করে আবুল হুসেনকে এক স্বীকারোক্তিপত্র লিখতে বাধ্য করা হয়, যাতে বলা হয় - ‘ঐ প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে আঘাত দিয়াছি সে জন্য আমি অপরাধী।’

ধর্মান্ধ ফ্যানাটিকদের কাছে মুক্তমনা আবুল হুসেনের এই অসহায় আত্মসমর্পন কি গ্যালিলিওর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় না, যিনি চার্চের চাপে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ভুল, আসলে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে! গ্যালিলিওর

মতই আত্মগ্লানিতে ভোগা আবুল হুসেন এ ধরনের স্বীকারোক্তি দিয়ে এতই ব্যথিত হলেন যে, সাহিত্য সমাজের সম্পাদকের পদ তো বটেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় পাড়ি জমালেন।

বেগম রোকেয়া :

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) ছিলেন এ দেশে নারী জাগরনের পথিকৃৎ। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল এক মুসলমান পরিবারে। ১৯০২ সাল থেকে মূলতঃ রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি কখনো সরাসরি, কখনোবা ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে সমাজের গোপন ক্ষত গুলোকে উন্মোচন করেছেন। তৎকালীন সময়ে বেগম রোকেয়া সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে যে মুক্তচিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই অভাবনীয়। রোকেয়া 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে বলেন :

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ... আমরা প্রথমতঃ যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি।... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগন ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

রোকেয়ার লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পাশ্চাত্যের এলিজাবেদ স্ট্যান্টনকে যিনি পাঁজরের হার থেকে নারী জন্মের উপাখ্যানকে শ্রেফ রূপকথা বলে ঘোষণা করে অবশেষে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন পুরো বাইবেলটিকেই। কারণ পুরো বাইবেলটিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ইভ-এর পাপের উপর তৈরী হয়ে। স্ট্যান্টন এবং রোকেয়া দুজনের বক্তব্যেই প্রথাবাদীরা চীৎকার করে ওঠে যার যার মত। রক্ষণশীলদের উন্মত্ততায় রোকেয়া শেষ পর্যন্ত ধর্মবিদ্বেষী 'আপত্তিকর অংশ'গুলো (পাঁচটি অনুচ্ছেদ) বাদ দিতে বাধ্য হন। ওই বাদ দেওয়া পাঁচটি অনুচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে রোকেয়ার যুক্তিবাদী মুক্তমন দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ডঃ হুমায়ুন আজাদের মতে, ওই আপত্তিকর নিষিদ্ধ অংশটুকুই রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ রচনা।

রোকেয়া ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো আপোষ করেছেন। অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলে ফেলেছেন, কিন্তু তাকে পশ্চাদপসারণও করতে হয়েছে। রোকেয়া পর্দা প্রথার সরাসরি বিরোধিতা করেননি, বরং প্রকারান্তরে সমর্থনই করেছেন :

> 'প্রয়োজন হইলে অবগুন্ঠন সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না।'

যে যুগে নারীর ঘরের বাইরে আসাটাই ছিল কঠিন, সে যুগে বোরখায় আবৃত করে হলেও অন্ততঃ বাইরে বের করে আনাটা জরুরী মনে করেছিলেন। রোকেয়া চাইছিলেন নারী বোরখা পরে হলেও বাইরে আসুক, সামাজিক কাজকর্মে অংশ নিক, শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী হোক, তাহলে হয়ত অপ্রয়োজনীয় পর্দার বাহুল্য এমনিতেই ঘুঁচে যাবে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন, আর বেগম রোকেয়ার নারীবাদেরই সার্থক উত্তরসূরী **তসলিমা নাসরিন, আহমেদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদের** এবং মত মুক্তমনারা। তারা তিনজনই স্বঘোষিত নিরীশ্বরবাদী। তিনজনের কথা একসাথে বলা হলেও চিন্তা চেতনা আর কাজে তিনজনই ভিন্নধর্মী কিন্তু আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ তিনজনই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন নিজেদের মত করে। একজনকে মৌলবাদীদের আক্রোশে দেশত্যাগ করতে হয়েছে, আরেকজন 'মুরতাদ' উপাধি বরণ করে নিয়েই মারা গেছেন, আর শেষোক্তজন তো সরাসরি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন মৌলবাদীদের চাপাতির আঘাতে।

আরজ আলী মাতুব্বর

যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর প্রগতিশীলতাকে এতোদিন কেবল 'শিক্ষিত এলিট শ্রেনীর' কর্মকান্ড বলে মনে করা হত, সে মিথটির গালে সজোরে আঘাত করেছেন এক গ্রাম্য কৃষক - **আরজ আলী মাতুব্বর**। যে মানুষটির দু'হাতে কড়া পড়েছিল লাঙ্গলের হাল ধরতে ধরতে, যার সারা দেহে ছিল পলিমাটির সোঁদো গন্ধ, কে জানত তিনি একদিন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের কর্ণধরদের অহমিকার ফানুস ফুটো করে দেবেন, হয়ে উঠবেন সারা বাংলার সত্যসন্ধানীদের আরাধ্য? আরজ আলীর দর্শনের ভিত্তি রামমোহন, ডিরোজিও কিংবা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যদের মত উপর তলা থেকে নেমে আসেনি, বরং তা উঠে এসেছিল লামচরি গ্রামের মত নীচু (আক্ষরিক অর্থেই) জায়গা থেকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিজ্ঞানমনস্কতা যাদের কাছে কেবল 'প্রগতিশীলতার বিলাস', সেই সব এলিট শ্রেণীর মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারীদের সাথে আরজ আলী মাতুব্বরের পার্থক্যটি স্পষ্ট। গ্রামীন মেহনতি কৃষক আরজ আলীর মুক্তবুদ্ধিচর্চা নাগরিক মধ্যবিত্তদের মত কেবল মানসিক ব্যায়াম ছিল না। বুদ্ধিবিলাসের আত্মরতিতে মগ্ন থেকে 'আঁতেল' সাজার মানসিকতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। সামাজিক দায়িত্ববোধই তাকে মুক্তবুদ্ধিচর্চায় প্ররোচিত করেছে। তার মা মারা গিয়েছিল। মার শেষ স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার চেষ্টায় এক ক্যামেরাম্যান ডেকে ছবি তুলেছিলেন তিনি মায়ের মৃতদেহের। এ 'নাফরমানির' অপরাধে গ্রাম্য মোল্লারা আরজ আলীর মায়ের জানাজা পড়তে চান নি। ব্যাস আরজ আলীর 'জ্ঞানচক্ষু' খুলে গেল। তিনি নামলেন সমাজ ও মনের কোনে

লুকিয়ে থাকা অন্ধবিশ্বাস, সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কার দূর করতে। প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন প্রথাগত সমাজকে। হাত পা ছুঁড়ে অনর্থক চীৎকার করেননি, বরং শান্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে গেছেন একের পর এক। অনেকটা **সক্রেটিসে**র (৪৬৩- ৩৯৯ খ্রীঃ পুঃ) মতই। সক্রেটিসের সাথে আরো অনেকদিকেই তার মিল ছিল। সক্রেটিস নিজেও ছিলেন শ্রমজীবী। অট্টালিকা ও ভাস্কর্যে ব্যবহারের জন্য মার্বেল পাথর কাটতেন। শক্ত পেশীতে টান পড়ত। টান পড়ত আরজ আলীর পেশীতেও - দিনের বেলা শক্ত হাতে লাঙ্গল চালিয়ে। তারপরও রাত জেগে করতেন জ্ঞান সাধনা। স্ত্রী অনুযোগ করেন 'দিনে এত খাটেন, আবার রাত জেগে পড়াশুনা করেন। কষ্ট হয় না?' আরজ আলী হাসতেন, 'না কষ্ট হবে কেন!' চাষাবাদের অর্থ জমিয়ে তৈরী করলেন পাঠগার। দশ বছরের চেষ্টায় সংগ্রহ করলেন ৯৬৬ খানা বই। কিন্তু প্রচন্ড ঘূর্ণিঝরে প্রায় পুরোটাই হারালেন। আবার আঠারো বছরের সাধনায় আস্তে আস্তে সংগ্রহ করলেন ৪০০ টি বই। কিন্তু আবারো ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সবকিছু হারালেন। আরজ আলী হতবিহবল হয়ে পড়লেন, সন্তান হারানোর ব্যথায় শোকে পাথর হলেন যেন। কিন্তু তারপরও জ্ঞান সাধনা আর লাইব্রেরী গড়বার প্রচেষ্টায় কখনই বিরত হননি।

আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশে আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শনের পথিকৃৎ। তিনি সত্যের সন্ধান বইটিরও আদি নাম দিয়েছিলেন - 'যুক্তিবাদ'। কোন সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ না ধরে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিবিচারের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার আরোহী (Inductive) পদ্ধতিকেই তিনি সঠিক মনে করেছেন। আরজ আলীর কাছে তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস কিংবা সংস্কারের কোন কিছুই সন্দেহের উর্ধ্বে থাকেনি। তিনি আত্মা, স্বর্গ-নরক, ভাগ্যলিপি, ফেরেস্তা, গোর আজাব, পাথর চুম্বন, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইত্যাদি অসংখ্য ধারণাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। সহজ সরল প্রশ্ন করেই তিনি আঘাত করেছেন অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তনে। আরজ আলী নিজেই বলেছেন :

> 'সত্যের সন্ধান দিয়ে আমি কুসংস্কারের ডালপালা ছেঁটে দিয়েছি। আর সৃষ্টিরহস্য দিয়ে কুসংস্কারের মূলশুদ্ধ উপরে ফেলেছি।'

প্রকৃতপক্ষে আরজ আলী যা পেরেছেন, তা এদেশের অনেক বড় বড় ডিগ্রীধারী দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরাও তা পারেনিনি। সেই সব বুদ্ধিজীবীদের একাংশ আবার আরজ আলীর রচনা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন - এগুলো আদপেই এক 'গ্রাম্য কৃষকের' রচিত কিনা। ঔপন্যাসিক হাসনাত আবদুল হাই তাই সঠিকভাবেই বলেছেন :

> 'আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তিকে শক্তহাতে নাড়িয়ে দিয়েছেন।'

৭

মুক্তমনার আত্মপ্রকাশ

আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০১ সালে প্রশ্ন আর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা এবং ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে মুক্তমনার প্রথমিক লড়াই সূচিত হলেও পাশাপাশি সারা পৃথিবী জুড়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত ফ্রিথিঙ্কারদের সহযোগী মানবতাবাদী সংগঠন হিসেবে কাজ করার সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয়। আসলে মানবিক দিকটি শুরু থেকেই মুক্তমনা কখনই অগ্রাহ্য করেনি। আমরা খবর পাই পাকিস্তানে ইউনুস শায়িখ নামের এক চিকিৎসক ব্লাস্ফেমি আইনের শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অপরাধ, তিনি শ্রেনীকক্ষে লেকচার দিতে গিয়ে নাকি ছাত্রদের বলেছেন মহানবী হযরত মুহম্মদ তার নবুওতপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত মুসলিম ছিলেন না। পাকিস্তানের মত ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ম এবং ধর্ম্প্রচারক সম্পর্কে সামান্য বিপরীত কথাবার্তা সহ্য করা হয় না। শাস্তি একটাই, মৃত্যুদন্ড। ইউনুস শায়িখ বন্দী হলেন এবং যথারীতি কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। মুক্তমনা এই ভাগ্যহত ব্যক্তির পাশে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো। আমরা পিটিশন আর প্রতিবাদলিপির বন্যায় পাকিস্তান সরকারের মেইলবক্স একেবারে ভর্তি করে ফেললাম। আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো আই.এইচ.ই.ইউ এবং র‍্যাশনালিস্ট ইনটারন্যাশনাল। আর অন্যদিকে ঢাকাতে ইউনুস শায়িখের মুক্তি এবং ব্লাস্ফেমি আইন বিলোপের দাবীতে দাবীতে প্লাকার্ড, পোস্টার হাতে বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে নিয়মতান্তিক আন্দোলন শুরু করলেন ডঃ অজয় রায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য মুক্তমনা সদস্যরা। মুক্তমনার শুভানুধ্যায়ী এবং হোস্ট ডঃ অ্যালেন লেভিন চারিদিকে নেটয়ার্ক তৈরী করে মানবতাবাদী সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও এক ছাতার নীচে নিয়ে আসলেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদীদের প্রবল চাপে পাকিস্তান সরকার একসময় গোপনে ডঃ শায়িখকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ডঃ শায়িখও সাথে সাথে দেশত্যাগ করলেন। ডঃ শায়িখ ক'দিন পরেই আমার সাথে যোগাযোগ করে মুক্তমনাকে তার পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। এর পরপরই তিনি মুক্তমনায় যোগদান করেন এবং বেশ ক'বছর ধরেই মুক্তমনায় লিখছেন।

ডঃ শায়িখের প্রোজেকটটি মুক্তমনার প্রথম দিককার অন্যতম সফল প্রজেকটগুলোর একটি। এটি সফল হওয়ায় আমাদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। আমরা ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় পিটিশন করেছি। আমিনা লাওয়াল নামের এক মহিলাকে 'শারিয়ার রজম' থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তমনা উদ্যোগী হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। তারপর থেকে মুক্তমনা আন্তর্জাতিকভাবে নানা ধরণের পিটিশন করেছে, আবেদন করেছে, কখনও প্যালেস্টাইনে নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধের দাবীতে, কখনও গুজরাতে গণহত্যার বিচারের দাবীতে, কখনও বা

উপমহাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায়, কখনও আওয়ামিলীগের জনসভায় বোমা হামলার নিন্দা করে, কখনও ভারতে নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করে, কখনও তথাকথিত 'বাংলা ভাই' কে গ্রেফতারের দাবীতে, কখনওবা কানসাটে গণহত্যা বন্ধের দাবীতে।

বিগত নির্বাচনের পর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে - যখন নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হল, তখন এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সচেতনতা তৈরী করতে শুরু করেছিল এই মুক্তমনাই। আসলে শুধুমাত্র 'অত্যাচার' আর 'নিপীড়ন' বললে বোধ হয় ভয়াবহতার মাত্রাটা বোঝা যাবে না। নিবাচনের পরবর্তী কয়েকমাসে ঠিক কি হয়েছিল, তা বোঝা যাবে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত জন ভাইদালের '**Rape and torture empties the villages**' (July 21, 2003) একটি প্রবন্ধ পড়ে নিলেই। প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্ণিমা রানীর মত হতভাগ্যদের উপর সে সময় কিরকমভাবে গণধর্ষনের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিলো। শুধুমাত্র পূর্ণিমা রানীই একমাত্র শিকার নন, ভাইদালের মতে নির্বাচনোত্তর তিন মাসে ডজনকে ডজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, অন্ততঃ এক হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আর কয়েক হাজার লোককের জমি-জমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এ ধরণের রিপোর্ট শুধু গার্ডিয়ানে বা হিন্দুস্থান টাইমসে নয়, পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল ডেইলি-স্টার, প্রথম-আলো, সংবাদ, জনকন্ঠ, ভোরের-কাগজসহ দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে। এমনকি মৌলবাদী আর সরকার সমর্থিত পত্রিকা ইনকিলাব আর সংগ্রামও একেবারে বাদ যায়নি। মুক্ত-মনার ঢাকা নিবাসী সদস্যরা 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র ব্যানারে ভোলা জেলায় অন্নদাপ্রসাদ নামের একটি গ্রামে সরোজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলো। তবে পর্যবেক্ষণই শুধু উদ্দেশ্য ছিলো না, সেই সাথে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিলো যারা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ও মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। আমরা দৃষ্টিপাত নামের একটি সংগঠনের সাথে মিলে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের দশটি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সম্মত হই। সরকার পক্ষ থেকে আমাদের কাজকর্মকে ভাল চোখে দেখা হল না। বক্তব্য দেয়া হল এই বলে যে *দেশের বাইরে এক 'বাংলাদেশ বিরোধী কুচক্রী মহল' দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে*। প্রধাণমন্ত্রী জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়ে বেশ কিছু জ্বালাময়ী ভাষণও দিলেন। রটিয়ে দেয়া হল যারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে তারা হয় ভারতের 'র' এর এজেন্ট, নয়ত ইহুদীদের 'মোসাদ'র আর নাহয় আমেরিকার সি.আই.এর! আমি সেসময় মুক্ত-মনায় '**যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমুর্তি এবং দেশপ্রেম**' নামের একটি প্রবন্ধ লিখি, বাংলায়। সে প্রবন্ধে আমি তুলে ধরেছিলাম দেশপ্রেমের যৌক্তিক সংজ্ঞা। বলেছিলাম, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশপ্রেম মানে কখনই দেশের মাটির প্রতি বা প্রাণহীন নদী-নালা আর পাহাড়-পর্বতের জন্য ভালবাসা হতে পারে না। দেশপ্রেম মানে

হওয়া উচিৎ দেশের মানুষের প্রতি প্রেম; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত অবহেলিত গণ-মানুষের প্রতি ভালবাসা। রাষ্ট্রের একটি প্রধানতম উপাদান হল জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি প্রাণহীন নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত আর মাটির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকে আর যাই বলা হোক, 'দেশপ্রেম' বলে অভিহিত করাার কোন যৌক্তিকতা নেই। উদ্ধৃতি হাজির করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের, আইন্সটাইনের আর হাল আমলের যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের; দেখিয়েছিলাম *প্যট্রিওটিজম*ও শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা *ডগমাই*। শুধু আমি নই, মুক্তমনার অন্যান্য সদস্যরাও এ নিয়ে বিস্তর লেখালিখি করেছেন। দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তমনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে সে সময় সচেতন মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন, কোন সরকারের অন্ধ আনুগত্যই দেশপ্রেম নয়। দেশে অরাজগতা, হত্যা নিপিড়নের কাহিনী যে কোন মূল্যে কার্পেটের নীচে পুরে রেখে দেশকে আকাশে তুলে রাখার নামই দেশপ্রেম নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলাটাও দেশপ্রেমের অংশ। সংকীর্ণ দেশপ্রেমের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে 'দেশের ভাবমূর্তি' দেখবার এই মানসিকতার উত্তোরণ একদিনে হয়নি। এর কৃতিত্ব মুক্তমনারা দাবী করতেই পারে।

মুক্তমনার সবচাইতে বড় অবদান সম্ভবতঃ ইন্টারনেটে (এবং পরবর্তীতে প্রিন্টেড মিডিয়ায়) বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার প্রসার। আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সে উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল, পরে এটি বই হিসেবে বেরোয়। বন্যা আহমেদর 'বিবর্তনের পথ ধরে' সিরিজটিও বই হিসবে বেরিয়াছে, সেই সাথে বেরিয়েছে আমার আর ফরিদ আহমেদের লেখা 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে'। প্রতিটি গ্রন্থের উদ্দেশ্যই একই। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসার। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছেন অপার্থিব, মেহুল কামদার, অনন্ত, তানবিরা, জাহেদ আহমেদ, জাফর উল্লাহ, অজয় রায় এবং আরো অনেকেই। ফোরামের লেখকদের থেকেই উঠে এসেছে 'যুক্তি'র মত ম্যাগাজিন, শিগগীরই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'মুক্তান্বেষা'। এই 'বিজ্ঞানমনস্কতা' ব্যাপারটি আমাদের কাছে সবসময়ই ভিন্ন অর্থ বহন করে। 'বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার' বলতে আমরা এটি বোঝাই না যে গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়া কিংবা উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা। ও গুলোর প্রয়োজন আছে কিন্তু তা করার জন্য রাষ্ট্র এবং সরকারই আছেন। আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার বলতে বোঝাই কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমুখী সমাজ গড়ার আন্দোলন। আমার ঢাকা কলেজের প্রিয় শিক্ষক আবদুললাহ আবু সাইদের ভাষায় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে 'আলোকিত মানুষ' গড়ার আন্দোলন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করলেই সে 'বিজ্ঞানমনস্ক' হয় না, হয় না আলোকিত মানুষ। তাই দেখা যায় এ যুগের অনেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেও বা বিজ্ঞানের কোন বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেও মনে প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেননি, পারেননি মন থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করতে। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত 'ইসলামী পদার্থ বিজ্ঞানী' আছেন যিনি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সন্ধান পান, মহানবীর মিরাজকে 'আইনস্টাইনের থিওরী অব

রিলেটিভিটি’ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান। ভারতের এক স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী আবার বেদ আর গীতার মধ্যে ‘বিগ-ব্যাং’ আর ‘টাইম-ডায়ালেশন’ খুঁজে পান। এরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন ঠিকই, চাকুরী ক্ষেত্রে সফলতাও হয়ত পেয়েছেন, কিন্তু মনের কোনে আবদ্ধ করে রেখেছেন সেই আজন্ম লালিত সংস্কারগুলো, আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান ধারণা। এই ‘বিজ্ঞানী’ তকমাধারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোই বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ‘বিজ্ঞানী’ নামধারী মানুষগুলোর কুসংস্কারের সাথে যেমন আমরা পরিচিত হয়েছি, ঠিক তেমনি আমাদের দেশে আরজ আলী মাতুব্বর বা রঞ্জিত বাওয়ালীর মত স্বল্পশিক্ষিত, ডিগ্রীহীন, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনমানসিকতার লির্লোভ মানুষও আমরা দেখেছি। এরাই আমাদের শক্তি।

মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে কারো কারো একটি বড় অভিযোগ মুক্তমনারা দেশের মানুষের জন্য খুব বেশী কিছু করেনা, যতটা না ঈশ্বর, আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা কিংবা ডারউইন ডে উদজাপনে ব্যয় করে। এ ধরণের অভিযোগ যারা করেন তারা ভুলে যান এ ক’বছরে মুক্তমনাদের সফল প্রোজেকটগুলোর কথা। হ্যা মুক্তমনা ঘটা করে ডারউইন ডে, হিউম্যানিস্ট ডে, র‍্যাশনালিস্ট ডে, আর্থ ডে ইত্যাদি পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়েছে দেশের মানুষের প্রয়োজনে মুক্তমনা সচেতনভাবেই এগিয়ে এসেছে। অধ্যাপক অজয় রায় সেকথাগুলোই শুনিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় জাহানারা ইমাম স্মারক সেমিনারে :

আমরা শুধু ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি শানাই না, আমরা মানবতার সপক্ষে লড়াইয়ে নামি ।

১. ব্লেসফেমির বিরুদ্ধে মানবতাকে বাঁচাতে পাকিস্তানের কারাদণ্ড প্রাপ্ত ফ্রিথিঙ্কার ড. ইউনুস শেইখকে বাঁচাতে বিশ্বময় আন্দোলন গড়ে তুলি । আমাদের সক্রিয় সহযোগী ছিল ‘IHEU, Rationalist International, Amnesty International, Dhaka Rationalist and Secularist Union ’ এবং ঢাকার মুক্তমনাদের ‘Save Dr. Yunus Shaikh Committee’, যারা রাস্তায় নেমে দিনের পর দিন আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, সেমিনার, পথসভা ও পাকিস্তানী দূতাবাসের সামনে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে । এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কবির চৌধুরী, বিচারপতি আবদুস সোবহানসহ দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও প্রগতির পক্ষের মানুষ ।
   আমাদের সাফল্য এসেছিল । পাকিস্থান সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় । বর্তমানে তিনি বিলেতে রয়েছেন এবং আমাদের একজন সক্রিয় সদস্য ।

২. আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি শাহরিয়ার কবিরের সপক্ষে তাঁর মুক্তির লক্ষ্যে, যখন খালেদা নিজামী সরকার তাবে বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে । আমরা সফল হই তাঁকে মুক্ত করতে দেশে বিদেশে গড়ে ওঠা সফল আন্দোলনের ফলে ।

৩. পরে দ্বিতীয়বার শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন ও সাংবাদিক সহ অনেক অবরুদ্ধ অত্যাচরিত

ব্যক্তিদের পক্ষে মানবতার মুক্তির পক্ষে আন্দোলনে নামি এবং এখানেও আমরা সফল হই ।

৪. আমরা এককভাবে ‘প্রশিকার পক্ষে’ নেটওয়ার্কে আন্দোলন গড়ে তুলি অ্যামনেস্টি ইনটার ন্যশনালের সহযোগিতায় । প্রশিকা মহাপরিচালককে মুক্তি দিতে বাধ্য হন সরকার ।

৫. আমরা সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ সামপ্রদায়িক নির্যাতনের বিরূদ্ধে সবর্দদাই উচ্চকণ্ঠ : আমরা মৌলবাদীদের হাতে মুসলমান বা হিন্দু যেই নির্যাতিত হয়েছে তাঁর পক্ষে দাড়িয়েছি, মৌলবাদী সম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে । গুজরাটে আহমদেবাদের জিঘাংসা বৃত্তিকে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি । নরেন্দ্রমোদীর বিরুদ্ধে তাঁকে অপসারণেরর দাবিতে আমরা ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক লিপি ও প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে একসাথে কাজ করেছি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে ।

৬. একইভাবে ২০০১ সালে খালেদা-নিজামীর লেলিয়ে দেয়া সামপ্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হত্যা, লূণ্ঠন, ঘরবাড়ি অগ্নি সংযোগ, উপাসনালয় ধ্বংস সাধন ও অপবিত্রকরণের যে ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থাপন করেছে তার বিরুদ্ধে দেশের সেক্যুলার শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এর বিরূদ্ধে রূখে দাড়িয়েছি । আমাদের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় রায় অন্যান্য মুক্তমনা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন ‘নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সামপ্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি’র ব্যানারে । তারা গঠন করেছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ‘গণ তদন্ত কমিশন’, যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০০২ সালে এবং তাৎক্ষণিকভাবে অমাদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয় । (http://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm) । প্রবাসী মুক্তমনার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের রাস্ট্রপতিকে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চালিত নির্যাতন বন্ধের দাবীতে । তাঁরা ঘৃনা প্রকাশ করেছেন মৌলবাদী শক্তিকে সরকার প্রশ্রয় দেয়ায় ।

৭. আমরা শুধূ তাত্ত্বিক আন্দোলন করি না । আমরা আর্ত মানবতার পাশে পার্থিবভাবেই এগিয়ে আসি । (ক). সাম্প্রদায়িকভাবে নির্যাতিত ভোলায় অন্নদাপ্রসাদ ও ফাতেমাবাদ গ্রামে ১০০টি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছি ‘দৃষ্টিপাত’ নামক আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পাশে । এই প্রকল্পে ১০০টি ঘরবাড়ি নির্মান, জমি ক্রয় করে দেয়া, ছেলেমেয়েদের পড়াশনার ব্যয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম । আমরা এসে দাড়িয়েছিলাম পুর্নিমার পাশে, রিতার পাশে, মাধূরীর পাশে, রাজকুমার বাবুর পাশে, নরহরি কবিরাজের পাশে, জনের পাশে, সিতাংশু মরমুর পাশে, ফাতেমার পাশে, মিনতির পাশে .. কত নাম করব– এরা সবাই নরপশূদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার ।

৮. আমরা সাংবাদিক মানিক সাহার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তাঁর দুটি কন্যার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সাহয্যের হাত বাড়িয়েছি । সাংবদিক বিভুরঞ্জনের পাশে দাড়িয়েছি ।

৯. দুর্ঘটনা কবলিত মানবতাবাদী শাহরিয়ার কবির, কাজী মুকুল ও তাদের সহকর্মূদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি যৎসামান্য শক্তি নিয়ে, আমরা ইসলামী মৌলবাদের শিকার হুমায়ূন আজাদের অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছি । হুমায়ুন অজাদ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে সহায়তা করেছি যতদূর আমাদের সাধ্যে কুলায় ।

১০. ব্রক্ষপুত্রের চরে বন্যাবিদ্ধস্ত একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আমরা পুনর্নির্মাণ করেছি, এবং আমরা এর পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেছি । সেখানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি স্থম্ভ গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং সে্‌উপলক্ষে কয়েক হাজার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সম্মেলন করেছি এবং স্মৃতি স্ত ম্ভের শিলান্যাস করেছি ।

১১. চোলেশ রিছিলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পিটিশন করেছি, তার পরিবারকে আর্থিকভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করেছি ।

১২. আমরা পিটিশন করেছি, বক্তব্য রেখেছি কিংবা জনসংয়োগ করেছি ভারতে অবৈধ নদী-সংযোগের প্রতিবাদে, গুজরাতে মুসলিম জনগণের উপরে নির্বিচারে গণহত্যার প্রতিবাদে, কানসাটে নিষ্ঠুরভাবে কৃষক-বিদ্রোহ দমনের প্রতিবাদে, জাফর ইকবাল এবং হাসান আজিজুল হককে সাম্প্রদায়িক মহল থেকে মৃত্যু-হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে, সি.আর.পি -এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালরি টেলরের অপসারণের প্রতিবাদে, কিংবা সালমান রুশদি অথবা তাসলিমা নাসরিনের উপর ফতোয়ার প্রতিবাদে ।

এগুলো কি দেশের মানুষের জন্য করা নয়? আত্মপ্রচারণার সুর ধ্বনিত হলেও, আমি বিনীত ভাবেই বলতে চাই মুক্তমনা উপরের সবগুলো কাজই সাফল্যের সাথে করেছে। তারপরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যারা যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের চেতনামুক্তি আর সেই পথ ধরে শোষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখেন তাদের কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতেই হবে। উপলক্ষ্য যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে পৌছুতে জনকল্যানমূলক কাজকর্ম কেবল উপলক্ষ্যই হতে পারে, এ বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রয়োজন। স্পষ্টই মনে রাখতে হবে এই সত্যটি- জনসেবা করে আর যাই করা যাক, সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানো যায় না, সার্বিক শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে

শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সচেতনাবোধ থেকে। সচেতনতাবোধ যেন তৈরী না হয় সে জন্য শোষিতের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখে শাসকশ্রেণী। গরীবের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখতে ধনীর অর্থে চলে 'দরিদ্র নারায়ণ সেবা।' দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই যাদের কেবল লক্ষ্য তারা আসলে কখনই চায় না সমাজ থেকে দারিদ্র দূর হোক, কেননা দারিদ্র দূর নয়, বরং দারিদ্রকে পুঁজি করে জনগণের 'মগজ ধোলাই'ই তাদের অন্তিম লক্ষ্য। এ ধরনের সেবামুলক কাজে দু' একটি দরিদ্রের তাৎক্ষণিক লাভ হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের জন্য পড়ে রয় অনন্ত বঞ্চনাময় জীবন। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করার চাইতে মগজ ধোলাই করে জনচিত্ত জয় করার পদ্ধতিটি সফলভাবে কাজে লাগায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সেজন্যই মাদার তেরেসা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবা সংঘ, তবলীগ জামাত, প্রমুখ নানা সংগঠন নানা কৌশলে জনকল্যানমূলক কাজের সাথে নিজেদের জড়িত রেখেছে। গড়ে উঠেছে ইসলামী এনজিও। কৌশলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ঠিকমত দান খয়রাত করলে, জাকাত দিলে দারিদ্র নাকি সমাজ থেকে এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। এ ধরনের দান খয়রাত, জাকাত আর সমাজ সেবার মাধ্যমে সমাজের শোষন মুক্তি ঘটেছে এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, সেবাসংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারটা মাদার তেরেসা, হাজি মুহসিন বাংলাদেশের কিংবা ভারতের জনতার শোষন মুক্তি ঘটাতে পারবে না। আমরা সমাজসেবার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু 'উদ্দেশ্যমূলক' জনসেবার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে মানুষকে অন্ধ রাখার অভিসন্ধির বিরুদ্ধে।

মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ মুক্তবুদ্ধি, নাস্তিক্যবাদ, মানবতাবাদ এগুলোর চর্চা করে তারা গনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। এর জবাবে প্রবীর ঘোষের মত বলা যায়, যে কোন অসুস্থ সমাজে সুস্থ সচেতন, যুক্তিবাদী মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিলিও, প্যারাসেলস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগর সহ বহু চিন্তাবিদের নাম করা যায় যারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজে একাকী। একাকী ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর বা আহমেদ শরীফও। কিন্তু এই সব বিদ্রোহী মানুষ গুলো প্রথাগত স্থবিরতাকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সে সময়কার বৃহত্তর জনগোষ্ঠি থেকে। সেকালের বিচ্ছিন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ছিল না তৎকালীন মানব গোষ্ঠির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এবং মগজ ব্যাচা বুদ্ধিজীবী তকমাধারী ফেউদের। আজ সে সব বিচ্ছিন্ন মানুষেরাই হয়ে উঠেছেন এক একজন মহামানব, শ্রদ্ধেয় আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ পঁচনধরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করা, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষনের অবসানমুখী সংগ্রাম, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে সুস্থ সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই কাম্য। একটা সময় আমরা দেখেছি ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদের বিকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমারা একে একে দেখেছি ভারতীয় লোকায়াত বা চার্বাক দর্শন, গ্রীসের আয়োনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের মোতাজিলা দর্শন, ইউরোপের দার্শনিকদের (বেকন, লক, হবস, হিউম

প্রমুখ) ইহজাগতিক দর্শন, ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপের রেঁনেসা এবং উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওদের কল্যাণে বাঙালিদের নবজাাগরণ; আমারা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী, জাতীয়ভাবে আমরা সহজিয়া, বাউলিয়ানার মত বিভিন্ন অজ্ঞেয় লোকজ মতবাদ, বিভিন্ন সমমনা ইহজাগতিক সংগঠন ও ব্যক্তির যুক্তিবাদী ভাবধারার উত্তরসূরী। ডঃ অজয় রায়ও ঠিক সেকথাই বলেছেন জাহানারা ইমাম স্মরণ সভায় :

> 'আমরা বিংশ শতাব্দির বাংলার উদারচেতা পুনর্জাগনের উত্তরসূরী, ডিরোজিওর চিন্তা চেতনার অনুসারী, আমরা মনে করি শিখা গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারক "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আরষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব", আমরা আরজ আলী মাতুব্বরের আদর্শের সৈনিক, আমরা বেগম রোকেয়া, লীলারায়, ফুলরেনূ গুহের, সুফিয়া কামালের, জাহানারা ইমামের পথে চলতে প্রত্যয়দীপ্ত .... ।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কুপমন্ডুকতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ এক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগনের মধ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি ভারতে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' সেদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী' চিন্তা আজ সেখানে ব্যক্তিগন্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপে পেয়েছে : আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছে লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্য সংস্থা বিজ্ঞান ক্লাব সহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টিতে। প্রত্যাশা বেড়েছে অনেক। তৈরী হয়েছে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। আমাদের দেশে 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ', 'জনবিজ্ঞান আন্দোলন', 'মুক্ত চিন্তা চর্চা কেন্দ্র', 'সিলেট যুক্তিবাদী সমিতি', 'বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি' -বিভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে উঠেছে প্রায় একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে। কুসংস্কার, ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক স্পর্ধিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রেখে চলেছে 'মুক্তমনা'। এদের কারণেই আজকে আমাদের এত বড় প্রাপ্তি। জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক প্রাপ্তির মত বিরল সন্মান অর্জন। আমি আর কোন বাঙালী ওয়েব সাইট বা ফোরামের খবর জানি না, যারা সাম্প্রতিক সময়ে এমন সন্মান অর্জন করে নিতে পেরেছে।

মুক্তমনার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ জানাই মুক্তমনার মডারেটরদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে।

তথ্যসূত্র :

- জাহানারা ইমাম স্মারক সভায় ড. অজয় রায়ের বক্তৃতা (২০০৭)
- অভিজিৎ রায়, বাঙালী সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা : দেশে ও বিদেশে, বিচিত্রা ঈদসংখ্যা
- মফিজুর রহমার রুননু, যুক্তিবাদ - চেতনামুক্তির লড়াই। বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি, ঢাকা (২০০১)।
- প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম ও ৩য় পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

- যতীন সরকার, মুক্তবুদ্ধিচর্চা ও বাঙালির লৌকিক এতিহ্য। আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা, ১৪০৭ (২০০০)।
- শফিকুর রহমান, হিউম্যানিজম, প্রমিথিউস পাবলিশার্স, ঢাকা (১৯৮৯)
- শফিকুর রহমান, পার্থিব জগৎ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা (১৯৮৭)
- যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম, সম্পাদনা : প্রবীর ঘোষ, অগ্রনী বুক ক্লাব, কলিকাতা (১৯৯২)
- আরজ আলী মাতুব্বর, আরজ আলী রচনা সমগ-১। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা (২০০০)
- লোকায়াত দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা (বাং ১৩৬৩)
- রাহুল সংস্কৃত্যায়ন, চেতনার দাসত্ব, অনুবাদ কমলেশ সেন, রবীন্দ্রগুপ্ত ও মলয় চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা (১৯৯৩)
- আবুল হুসেন, নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা (২০০০)
- বেগম রোকেয়া রচনাবলী, বর্ণায়ন, ঢাকা (২০০০)
- Mukto-mona : A Secular site for Bengali humanists & freethinkers (www.mukto-mona.com)

অভিজিৎ রায়, ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com